

কাবুলিওয়ালা

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Typeset in this format by Lakshmi K. Raut

আমার পাঁচবছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি এক দন্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার প্র হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এই জন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদ হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, “বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিছু জানে না। না?”

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনিত হইল। “দেখো বাবা ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে। তাই বৃষ্টি হয়। মা গো, ভোলা এত মিছি মিছি বকতে পারে। কেবলই বকে, দিন রাত বকে।”

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছু মাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, “বাবা, মা তোমার কে হয়।”

মনে মনে কহিলাম, শ্যালিকা; মুখে কহিলাম, “মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা করগে যা। আমার এখন কাজ আছে।”

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতি দ্রুত উচ্চারণে আগডুম-বাগডুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তখন কাঞ্চন মালাকে লইয়া আন্ধকার রাতে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্ন বর্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হটাৎ মিনি আগডুম-বাগডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, “কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।”

ময়লা টিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে দুই-চার আঙুরের বাস্ক, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতে ছিল – তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যা রত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে উর্ধ্বশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই ঝুড়ি ঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু, মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল অমনি সে উর্ধ্বশ্বাসে আন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মত ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এদিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল – আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চন মালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভালো হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুস, ইংরাজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষণীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল। আবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু, তোমার লেড়কি কোথায় গেল।”

আমি মিনির আমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার আভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম – সে আমার গা ঘেসিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্ধিক্ষণ নত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির

মধ্য হইতে কিসমিস্ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই নিল না, দ্বিগুন স্নেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যিকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির ওপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে, এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামত ও দো আঁশলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের আভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম কিসমিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, “উহাকে এ-সব কেন দিয়াছ। অমন আর দিও না।” বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোল-আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা স্নেহ চক্চকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্তসনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “তুই এই আধুলি কোথায় পেলি?”

মিনি বলিতেছে, “কাবুলিওয়ালা দিয়েছে।”

তাহার মা বলিতেছেন, “কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে তুই আধুলি কেন নিতে গেলি।”

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, “আমি চাই নি, সে আপনি দিলে।”

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম। সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র লুক্র হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে – যথা রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, “কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুড়ির ভিতর কি।”

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, “হাঁতি।”

অর্থাৎ, তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে এইটেই তার পরিহাসের সূক্ষ্মমর্ম। খুব যে বেশি সুক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই প্রিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক আনুভব করিত – এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্ৰাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য কেখিয়া আমার বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত “শোঁখী, তোমি সসুবাড়ি কখন যাবে না।”

বাঙালির ঘরের মেয়ে আজন্মকাল ‘শুশুরবাড়ি’ শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরনের লোক হওয়াতে শিশু মেয়েকে শুশুরবাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এইজন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না। আথাচ কথাটার একটা কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকি নিতান্ত তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ, সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, “তুমি শুশুরবাড়ি যাবে?”

রহমত কাল্পনিক শুশুরের প্রতি প্রকান্ড মুষ্টি আক্ষফালন করিয়া বলিত, “হামি সসুরকে মারবে।”

শুনিয়া মিনি শুশুর নামক কোন এক অপরিচিত জীবের দূরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ শরত কাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগবিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেই জন্যই আমার মনটা পৃথিবী ময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্বদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমনি বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয়, এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এদিকে আমি এমনিই উদ্ভিঞ্জপ্রকৃতি যে, আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এইজন্য সকালবেলায় আমার ছোটো ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প

করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমনের কাজ হইত। দুই ধারে বন্ধুর দুর্গম দক্ষ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সংকীর্ণ মরুপথ, বোঝাই-করা উষ্টের শ্রেণী চলিয়াছে ; পাগড়িপরা বণিক ও পথিকেরা কেহ-বা উষ্টের পরে, কেহ-বা পদব্রজে ; কাহারও হাতে বর্শা, কাহারও হাতে সেকলে চক্ৰমকি-ঠোকা বন্ধুক – কাবুলি মেঘমন্দস্বরে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিত আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক ; রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলে তাঁহার মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষজ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া ঝুঁয়োপোকা আরশোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ এতদিন (খুব বেশিদিন নহে) পৃথিবীতে বাসকরিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমত কাবুলিওয়ালার স্বমন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বার বার আনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গুটি কতক প্রশ্ন করিলেন, “কখনো কাহারও ছেলে চুরি যায় না। কাবুল দেশে কি দাস-ব্যবসা প্রচলিত নাই। একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোট ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া কি একেবারে অসম্ভব।”

আমাকে মানিতে হইল, ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে, কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এই জন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমত দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয়, কিন্তু তবু একবার মনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যেদিন আসিতে পারে না সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে। আন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলে-ঢালা-জামা-পায়জামা পরা সেই ঝোলাঝুলিওয়ালার মন্থা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কিন্তু, যখন দেখি মিনি ‘কাবুলিওয়ালার, ও কাবুলিওয়ালার’

করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই আসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোটো ঘরে বসিয়া প্রফর্শিট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্বে আজ দুই-তিন দিন হইতে শীতটা খুব কনকনে হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে ; বেলা বোধ করি আটটা হইবে, মাথায়-গলাবন্ধ-জড়ানো উষচরণণ প্রাতভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় কল্পে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতদই পাহারাওয়ালার বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে – তাহার পশ্চাতে কৌতুহলী ছেলের দল চেলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্ত চিহ্ন এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম ; জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিষ্টিতে ধারিত – মিথ্যা পূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে তাহাকে এক ছুরি বসিয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ আশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময় ‘কাবুলিওয়ালার, ও কাবুলিওয়ালার’ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুক হাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার ঋক্কে আজ ঝুলি ছিল না, সুতারাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে ?”

রহমত হাসিয়া কহিল, “সেখানেই যাচ্ছে।”

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, “সসুরাকে মারিতাম, কিন্তু কি করিব, হাত বাঁধা।”

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল ।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম । আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমত নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষাপান করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না ।

আর, চঞ্চল হৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জা জনক তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয় । সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল । পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল । এমন-কি, এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না । আমি তো তার সংগে একরকম আড়ি করিয়াছি ।

কত বৎসর কাটিয়া গেল । আর-একটি শরৎকাল আসিয়াছে । আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে । পূজার ছুটির মধ্যে তাহার বিবাহ হইবে । কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে ।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে । বর্ষার পরে এই শরতের নূতন ধৌত রৌদ্র যেন সোহাগায়-গলানো নির্মল সোনার মত রং ধরিয়াছে । এমন-কি, কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টকজর্জর আপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলির উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাভন্য বিস্তার করিয়াছে । আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে । করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সমস্ত বিশৃঙ্খলময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে । আজ আমার মিনির বিবাহ ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা । উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে ; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে ; হাঁকডাকের সীমা নাই । আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল ।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না । তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে সে

পূর্বের মতো সে তেজ নাই । অবশেষে তাহার হাঁসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম ।

কহিলাম, “কী রে রহমত, কবে আসিলি ?”

সে কহিল, “কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি ।”

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট করিয়া উঠিল । কোনো খুনিকে কখনো প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকুচিত হইয়া গেল । আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলে ভালো হয় ।

আমি তাহাকে কহিলাম, “আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও ।”

কথাটা শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, “খোঁকিকে একবার দেখিতে পাইব না ?”

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল মিনি সেই ভাবে আছে । সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্বের মতো ‘কাবুলিওয়ালো, ও কাবুলিওয়ালো’ করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই কৌতুকবহ পুরাতন হাস্যলাপের কোনরূপ ব্যত্যয় হইবে না । এমন-কি, পূর্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে এক বাস্র আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিসমিস্ বাদাম বোধ করি কোনো স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল — তাহার সে নিজের ঝুলিটি আর ছিল না ।

আমি কহিলাম, “আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না ।”

সে যেন ক্ষুণ্ণ হইল । স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে ‘বাবু সেলাম’ বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল ।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা হইল । মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময় দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে ।

কাছে আসিয়া কহিল, “এই আঙুর এবং কিষ্কিৎ কিস্মিস্ বাদাম খোঁকির জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।”

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল ; কহিল, “আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে – আমাকে পয়সা দিবেন না। বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কি আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কি আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁকির জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।”

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত টিলা জামাটার ভিতর হাত ঢালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি হাতের ছাপ। ফোটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুয়া মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে – যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম – তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বতবৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্ত চিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুর ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু, আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙা-চেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

অগ্রহায়ণ ১২৯৯

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। আবশেষে হাসিয়া কহিল, “খোঁকি, তুমি সসুরবাড়ি যাবিস্?”

মিনি এখন শ্বশুরবাড়ির অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্বের মতো উত্তর দিতে পারিলনা, রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে – তাহাকে পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কী হইয়াছে তাই বা কে জানে। সকালবেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতর বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, “রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও ; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।”

এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেক্ট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপুরে মেয়েরা আতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।